জোড়া বকুল

সলিল ঘোষাল

কাঁথার বুকে নিবিষ্ট মনের সূচের ফোঁড় তোলাতে রূপ নিচ্ছিল ফুল লতাপাতা উড়ন্ত প্রজাপতির। পুরনো শাড়ি অথবা ধুতি বাবুদের বাড়ির। পাড়ের থেকে সুতো তোলা এবং কাঁথা সেলাইয়ের মজুরি বাবদ বাইশ থেকে পঁচিশ টাকা চারুবালার রোজগার। সংসারের ঝক্কি সামলে ফুরসত টাইমে একটা প্রমাণ সাইজের কাঁথা তৈরি করতে সময় লাগে চার থেকে পাঁচদিন ঘন্টা তিনেক করে। তার মানে ঘন্টাপিছু রোজ দাঁড়ায়— 'দূর বাবু অতো হিসেব মাথায় আসে না।' কপালের দুপাশে জমে ওটা বিনকুড়ি ঘামের কণাগুলো শাড়ির আঁচলে মুছে মুখ ফেরাতেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে চারু, 'ওই দ্যাকোগো বিকেলের পোড়া রোদখানা ঘুমন্ত মানুষটার মুখে এসে পড়েছে!' পাশে পড়ে থাকা একটা ধুতি টালির চাল থেকে সটান ঝুলিয়ে দিতেই পুরো না হলেও শেষ বেলাকার ঝাজালো লালচে তেজটাকে কিছুটা আড়াল করা গেল। ঘরের দাবায় মাদুর পেতে তেলচিটে বালিশ মাথায় ভাতঘুমে আচ্ছন্ন নিশে। নিশিকান্ত সাউ তামাটে রঙের রোগা লম্বা চেহারার হেঁকোডেকো প্রকৃতির একটা মানুষ। কোমরে জড়ানো লুঙ্গিটা গুটিয়েমুটিয়ে উরু বরাবর তোলা। শরীরের যতটা উলঙ্গ রাখা যায় ততটাই লাভ, একটু ঝিরঝিরে বাতাস এসে তবু যদি গরমের জ্বলুনি থেকে এক চিলতে স্বস্তি দেয়। হাঁটুর নিচটায় দগদগে একটা ঘা। এখন কিছুটা সেরে এলেও, আজ সেই সকাল থেকে দুপুর বরাবর রামনগরের বামুপাড়ায় কোন বাবুদের পুকুরে গুঁড়িপানা তুলতে গিয়ে জল ঘেটে ঘেঁটে ঘাটা বেশ জবজবে হয়ে উঠেছে। ঘুমের ঘোরে নিশিকান্ত মাঝেমাঝেই পাটা ঝাঁকায়— 'ও মাগো, কত বড় এট্টা ডাঁশ রস খাবার ধান্দায় ঘাটায় এসে বস্‌চে! রাক্ষুসে মাচি, মানুষের রক্ত চুষে চুষে খায়।' হাতের কাছ থেকে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে চারুবালা মাছি তাড়াতে আচল নাড়ে। শেষ বেলাতেও রোদের তাই খৈ ফোটায়। যতদুর চোখ যায় খাঁ - খাঁ প্রান্তরে কিলবিলিয়ে হল্কা ওঠে। দম্‌কা হাওয়ার পাক খাওয়া নোনা বালি গোঁয়ার গতিতে এদিক - ওদিক ছুটে যায়, এর ওর ঘরদোরে ঢুকে পড়ে। এটা নোনা নদীর চর। কোন খেয়ালে নদী ক্রমে দক্ষিণে উদোসখালির বুকে কামড় মেরে উত্তরদিকে প্রকাণ্ড একটা চর গড়ে তুলেছে। চরের জমি এখনও মাটির চরিত্র পায়নি। নাবালিকা ভূখণ্ড — শরীর পেয়েছে, গড়ন হয়েছে, স্তরে স্তরে সৌন্দর্য বাড়ালেও প্রকৃতির নিয়মের খেয়ালে তার শরীরের অতি গভীর প্রদেশে সেই আদি রহস্যটার খেলা এখনও শুরু হয়নি। পাতালের বুক ফুঁড়ে জেগে ওঠা ধূসর ভূভাগ এরমধ্যে মাতৃত্ব দেবার ক্ষমতা পাবেই বা কোথায়! সবে তো বছর সাত - আটেক হল এর জন্ম। তাই যতই এটাসেটা গাছ লাগাও, জল ঢালো, যত্ন করো, কিছুদিনের মধ্যেই হয় শুকিয়ে যাবে, নয়তো ডাল পাতা কুঁকড়ে রিকেট বাচ্চার মতো বেঁচেবর্তে থাকবে বটে— ফুল হবে না, ফল ধরবে না।

বছর দু-তিন হলো চরের কোলে বাঁধ বেঁধে দু-পাঁচ ঘর জেলে - মাঝি বসত জমায়। মা বনবিবির থানাকে ঘিরে একটা চা-পান - বিড়ির দোকান, ছোঁ জাল মেরামতি, নৌকো সারানোর টুকিটাকি কাজ চলে। তখন চরের কোনও নাম ছিল না, লোকে বলতো বোটেভাঙার চর। কয়েক বছর আগে সরকারি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের একটা বোট জলের তলায় ঘামটি মারা নতুন গজানো এই চরের ধাক্কায় ভেঙে পড়ার থেকেই মুখচলিত নাম। বর্তমানে অবশ্য সরকারিভাবে চরের নতুন নামকরণ 'সুকন্যা'। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দোখ্‌নো মানুষগুলো চরের এমন সুন্দর গালভরা নামটিকে তাদের আটপৌরে জীবনের মতো সোজাসাপটা করে নিয়ে এর হদিস দেয়— 'সুকোর চর'। সুকোর চরে পাট্টা বিলি হয়েছে। বসত জমি। পরিবার পিছু আড়াই কাঠা। ঘটা করে পাট্টা বিলির অনুষ্ঠানে নেতা মন্ত্রী আমলাদের সুকোর চরে পা পড়াতে স্থানীয় মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। তবে জমির পাট্টা নিতে নয়, পাট্টা বিলি দেখতে। তারা জানতো — যে জমিতে আশ্বিনে ঘাস জন্মালে মাঘের মুখেই সেই ঘাস পুড়ে খড় হয়, তাই একে ওকে তেল মেরে ওই নোনা চরে জমি পাবার লালচ তারা অনুভব করেনি।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর মানুষ কোন দূর গ্রাম থেকে এসে সুকোর চরে বসত গেড়েছে। শোনা গেছে আরও আসবে। তখন চরটাই গোটা একটা গ্রাম হয়ে উঠবে। এখানে রস্তা হবে, ছোটখাটো দু-একটা দোকান বসবে। গড়িয়ে উঠবে পার্টি অফিস, ক্লাব। সরকারি বদান্যতায় হয়তো একটা খিচুড়ি ইস্কুল। বছরের পর বছর মানুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে একদিন বন্ধ্যামাটি মানুষের দিকে মুখ তুলে তাকাবে। চর ফুঁড়ে সবুজ উঁকি মারবে আদরের ফসলের বেশে। ঝাঁকা বোঝাই ফসল রিক্সাভ্যানে চেপে হাটে চলে যাবে নিলামের মুখে। বিনিময়ে মানুষের হাতে আসবে মেহনতের দাম। মুখে হাসি ফুটবে, চোখে স্বপ্ন— আরও ফসল চাই, আরও। তাই উঁচু জাতের বীজ চাই, সার চাই, সেচের জন্যে নিদেন হাজার আট - নয়ে পেট্রোল স্টার্টিং কেরোসিন রানিং চায়না ভুটভুটি ইঞ্জিন। পোকার হাত থেকে সবুজ স্বপ্নগুলো বাঁচানোর জন্য বিষ চাই। চাই সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র। চাহিদা পুরণের জন্য ছোটখাটো একটা বাজারও তৈরি হতে পারে। এমনিকরে হজা মজা বোটে ভাঙারচর একদিন হয়তো সুকন্যা হয়ে পরিপূর্ণ একটা গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তুলবে।

চরের বুকে যারা ঘর বাঁধতে এসেছে তাদেরও একটা গ্রাম ছিল। দেড়শো দুশো কিংবা হয়তো তিনশো বছর

ধরে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সুন্দর সমৃদ্ধ একটা গ্রাম। সেই গ্রামটা এখন আর গ্রাম থাকবে না, রাতারাতি ভোল পাল্টে আস্ত একটা শহর হয়ে যাবে। তাই গ্রামের মানুষকেও গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। বসবাসের জন্যে তাদের নতুন করে আবার একটা গরাম গড়ে নিতে হবে, আবার দেখাতে হবে আলাদিনের পিদ্দিম-দানোর আশ্চর্য যাদুর কেরামতি। ফেলে আসা জায়গায় থাকবে শহরের লোকজন। তাদের জন্যে সেখানে চওড়া চওড়া রাস্তা হবে, রাস্তার দুধারে মেঘ ছুঁই ছুঁই বাড়ি, চোখ ধাঁধানো দোকান বাজার, ঝাঁ চকচকে হোটেল, আমোদ আনন্দের কত কি আয়োজন।

'কইরে, নিশিকান্ত বাড়ি আসিস নাকি?' আঁচল নাড়তে নাড়তে চারুবালার দু'চোখের পাতায় একটু ঝিম ধরেছিল। ডাক শুনে ধরফড়িয়ে উঠে— 'ওমা, সুবোল ঠাকুরপো যে! এসো এসো। এগো শুনছো, সুবোল ঠাকুরপো এসেছে'। চালের আড়ায় গোঁজা হাঁফ ছেঁড়া পাতির মাদুরটা পেতে দিতে দিতে চারুবালা বলে— 'বসো ঠাকুরপো, দ্যাখো না তোমার বন্ধুর কাণ্ডখান, ওই ঘেয়ো পা নিয়ে সারাবেলা কোন পুকুরে...।' চারুবালার কথা শেষ না হতেই, নিশিকান্ত খেঁকিয়ে ওঠে— 'সোহাগ মারাতি সারাডাদিন এঁদো পুকুরে পানা তুলেছি না? দুটো পয়সার ধান্দায় চাষার ঘরের ছেলে হয়ে পরের দোরে জনমজুরের কাজ করতে হচ্ছে। তাও শালার কপালে কাজ জোটে! পাঁচদিন এদোর ওদোর করে একদিন যদি শিকে ছেঁড়ে।' চারুবালা চুপ, সে জানে স্বামী তার কেমন রগচটা, খেপে গেলে মানুষটার হুঁশজ্ঞান থাকে না। এইতো কদিন আগে, কার বাড়ির একটা ধামড়ি ছাগল সবেসবে পোঁতা লঙ্কাচাড়াগুলোর মুড়তে মানুষটা এমন রেগে গেল! একটা লাঠি নিয়ে রে-রে করে ছাগলটার পিছনে ধাওয়া করলো। দামড়িটা পালালো, আর নিজে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে আধপোঁতা পুরনো ভাঙাচোরা নৌকোর কাঠের গুঁতোয়। হাঁটুর তলা থেকে এক খাবলা মাংস উঠে ঝুঁজিয়ে রক্ত ঝরলো, দিকে খেয়াল নেই, গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরলো— শালা কত কষ্টে বাঁচানো লঙ্কাচাড়াগুলো হারামি ছাগলটা খেয়ে গেল। শালা কেউ বোঝে, এই মরুভূমিতে গাছ বাঁচানো কতবড় মদ্দের কাজ। চারার দিকে হাঁ করে ঠায় বসে থাকতে হয়, কবে ডগ থেকে নতুন দুটো দুধ - সবুজ পাতা ছাড়বে, কবে গাঁট ফুঁড়ে নতুন একটা হোঁক ঠেলে বেরুবে, ছোট্টা একটা ডাল, তার লাগোয়া আরও কয়েকটা, ক্রমে গাছটা একটু গতুরে হবে, একি শালা আমাদের শিঙিরজলার মতন মাটি! আহা মাটি তো নয়, যেন সোনা। আর এই জমি! রসকস নেই, মাটিতে জো ধরে না, শুধু বালি আর বালি, মনে হয় যেন মরা বাবার চিতের ওপর ঘর করা।

সুবল কথা ঘোরায় — 'যাকগে, ওসব কথা রাখ। তোর পায়ের ঘাটা একটু নরম হয়েছে তো?' নিশিকান্ত ঘায়ের চারপাশে হাত বুলোয়... 'হ্যাঁ, তা একটু নরমের দিকে। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ভ্যারেন্ডা গাযে আটা লাগিয়েছি। আর দু-চারবার লাগাতে পারলে ঘাটা মুসড়ে যেতো। তা যে জায়গায় আমরা ঘর বেঁধেছি আশপাশে একটা ভ্যারেন্ডা গাছ পাবে? শালার ভাগাড়ে একটা খাগড়া পর্যন্ত জন্মায় না।' এই রগচটা মানুষটার ঝাঁজালো কথায় সুবলের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চিড়বিড় করলেও মুখে ফ্যাকাসে হাসি ধরে রাখে— 'নিশেভাই বড্ড খোচে আছে। বলে ও জায়গায় নাকি ভ্যারেন্ডা গাছ পাওয়া যায় না! শালার জঙ্গুলে গাছ চারধারে ঢালাও জন্মে রয়েছে। বৌদি ওই দূরে সাবেক ভেড়ির ধার থেকে নিশের জন্যে ভ্যারেন্ডার চাট্টি ডাল ভেঙে এনো তো। কত আটা লাগাবি, এন্তার লাগা। যাক্‌গে যে দরকারে এসেছিলুম— ভাকুদা খবর দিয়েছে, আর সন্ধ্যেবেলা পার্টি অফিসে যেতে, জরুরি মিটিং। গত তিনতিনটে মিটিংয়ে তুই যাসনি, ভাকুদা তোর মতিগতির খোঁজ নিচ্ছিল। ভাকুদাকে তো চিনিস।' নিশিকান্ত ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে ওঠে— 'কি আমার ছিঁড়বে তোদের ভাকুদা। আমাগে ভিটেছাড়া করবে, এই চর থেকে তাড়াবে নাকি একটা কেস খাইয়ে হাজতে পুরবে? ওরে বাপুরে এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়। তোদের ভাকুদার মত এমপি, এমেলেদের ইয়েতে তেল মাখানো লোকাল নেতা অনেক দেখেছি। পার্টি আমরা করিনি? লড়াই কাকে বলে তা আমরাও জানি। কাকে ভয় দেখাচ্ছিস? ওই নতুন কাগে গু-ঠুকরতে শেখা, দুকলম লেখাপড়া জানা, পয়সাঅলা নেতাদের ভয়ে মুতে ফেলবো?'

নিহাতই মানুষটা রাগে টং হয়ে আছে দেখে সুবল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চারুবালাকে আড়ালে ডেকে বলে— 'গোঁয়ারটাকে বুঝিয়ে - সুঝিয়ে সন্ধেবেলা পার্টি অফিসে পাঠিও, আখরে লাভই হবে।' সুবলের কথামতো চারুবালা বোঝানোতে কাজ হয়েছিল। সন্ধের মিটিং সেরে গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষটা বেশ খুশিমনে বাড়ি ফেরে— 'চারু চল, কাল একবার নিজেদের পুরনো গাঁটা ঘুরে আসি। পার্টি অফিসে শুনলুম, আমাদের শিঙিরজলা নাকি নতুন সাজে সেজেছে— কী একটা ইংরিজি নামও হয়েছে। তাই ফিতে কাটতে বড় মিটিং। মন্ত্রীরা আসবে। গেলেই মাথাপিছু পঞ্চাশ - পঞ্চাশ একশটা টাকাও মুফতে পাওয়া যাবে। মনে হচ্ছে ভ্যারেন্ডার আটার কম্মো নয়, ঘাটার জন্যে ডাক্তারের গব্বায় কিছু ঢালতে হবে।

সুকোর চরের বাসিন্দাদের জন্য বরাদ্দ একটা লরির মধ্যে ঠাসাঠাসি বসা একদল নারী পুরুষ। তারমধ্যে পঞ্চাশ - পঞ্চাশ কড়কড়ে এক'শ টাকার ধান্দায় এবং পুরনো গাঁ - ভিটের টানে নিশিকান্ত ও চারুবালা। নিশির গায়ে জড়ানো চাদরটা চারুবালা ঠিকঠাক করে দেয়। কাল রাতে মানুষটা বেদম জ্বর ছুটেছিল। সকালে দুটো জ্বরের বড়ি

খেয়ে হালকা ঘাম দিয়ে গায়ের আগনপোড়া ভাবটা একটু থিতিয়েছে। সুকন্যার বুক চিরে লরি চলেছে সরকারি রাস্তার দিকে। এবড়ো - খেবড়ো চরভূমিতে লরির নাচনে মানুষ দোলে। ভাকুদাও যাচ্ছে একই লরিতে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে। ভাকুদার শাকরেদদের জোরালো স্লোগান— তাতে কেউ সাড়া দিচ্ছে কেউবা দিচ্ছে না। তারা আকাশ দেখছে, দিশাহীন ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের স্তুপ, উড়ন্ত পাখির ঝাঁকা। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে গোঁ-গোঁ শব্দের লড়ি পিছনে ফেলে আসছে পথের দুপাশে ধানখেত, পানাপুকুরে রেখা টেনেটেনে হাঁসেদের চলাচল। ছোট-ছোট কুঁড়েঘর, খোঁটায় বাঁধা গরু, চরা - খাওয়া ছাগল। স্লোগান উঠছে, পথও ক্রমে চওড়া হচ্ছে— অটোরিক্সার দুরন্ত গতিতে পাশ কাটানোর খেলা, দোকান, বাজার, উঁচু টাওয়ার — টাটা, এয়ারটেল কিংবা রিলায়েন্স। স্লোগানের পর স্লোগান, পথ মিশেছে জনসভায়।

'এই কি আমাদের শিঙিরজলা! কিছুই চেনার জো নেই গো, এতো সপ্তপুরী।' মিটিং চলছে— মাইকে মাইকে ছয়লাপ। কিছুটা দুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়িয়ে বাস লরি ম্যাটাডোর। মিটিং চলছে— গ্রাম - গঞ্জের থিকথিকে কালোমাথার ঠাসবুনোন। মিটিং চলছে— অনেক দূরে মঞ্চ, কিছুই দেখা যায় না। সবকিছুই ঝাপসা জলছবির আদলে বুঝে নিতে হয় আজকের শিঙিরজলার মতো। মাইকে প্রচার— তিনি আসছেন, তাঁরা আসছেন, স্লোগান উঠছে, পতাকা দুলছে, হাততালি আর হাততালি। তাঁরা এলেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় মঞ্চে যেন একসার কাশফুলের যাওয়া আসা, হাওয়ার তালে দোল খাওয়া মিটিং চলছে—মাইকের চোঙা থেকে ভেসে আসে একেকটি কণ্ঠের একের রকমের হুংকার। —'দূর শুমুন্দি ঘুরেফিরে একই কথা, ওসব আর ভালো লাগে না। চারু চল দেখি আমাদের ভিটেটার কী হাল হল'। নিশিকান্ত চারুবালার হাত ধরে টানে। চারুবালা যেন এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

বড় রাস্তা থেকে ছোট ছোট বাঁধানো রাস্তা এপাশে ওপাশে ঢুকে গেছে। হাল শহরের মাঝে হারিয়ে যাওয়া সাবেক শিঙিরজলার এক দম্পতি কোনদিকে যাবে বুঝে উঠতে পারে না। এ মাটি এখন আর তাদের নয়, এ অন্য কারও। একটাও নিশানা তারা ঠিক করতে পারে না, যেটাকে সম্বল করে তাদের সাত পুরুষের ভদ্রাসনটাকে চেনা যায়। কোথায় বটতলা! কোথায় বটতলা! কোথায় হারিয়ে গেছে বিশাল তেঁতুলগাছের তলায় মা শীতলার থান! কিছুই ঠাওর করা যায় না। আকাশের দিকে তাকায়— নাঃ, আকাশটাও কেমন যেন অচেনা অচেনা। আকাশের সেই রঙ নেই, তার বুকের মেঘেদের ভেসে বেড়ানো নেই, সবুজ ধানখেতের গায়ে সোহাগি - স্ত্রীর মত সেই ঢলে পড়া নেই। এদিক - ওদিক, এ-রাস্তা সে - রাস্তায় পাক খেতে থাকে নিশিকান্ত চারুবালা। কোথায় লুকিয়েছে তাদের ভদ্রাসন। মাগো মা, আমরা এতই পর হয়ে গেছি যে আমাদের ধরা দিবি না। হঠাৎ চারুবালার নজরে পড়ে— বড় একটা গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বকুল গাছ। আছে গো আছে, এখনো রক্ষে আছে বাপ - ঠাকুরদ্দার ভিটেয় চিরকেলে সেই জোড়া - বকুল। সেই গুঁড়ি, সেই ডাল, তবে আগের সেই ঝলমলে তাজা সব্জে ভাবটা হারিয়ে একটু যেন মনমরা। শ্বশুরের ভিটে পিঠের দিকের শাড়ির প্রান্তভাগ ঘোমটা হয়ে চারুর মাথায় উঠে আসে। কিগো, তোমরা আমাদের চিনতে পেরেছো? মৃদু বাতাসে বকুলের ঘন পাতাগুলো দুলতে থাকে। দু-একটা ঘিয়ে-সাদা ফুল মাটিতে ঝরে পড়ে। চিনেছে! ওরা আমাদের ঠিক চিনতে পেরেছে। কেন চিনবে না? আমাদের সঙ্গে কি ওদের একদিনের সম্পর্ক, কত দিনের, কত কালের, কত বছরের ভালোবাসা। আমরাই বাপ্-ঠাকুদ্দার আমলের ভিটেটাকে ধরে রাখতে পারিনি। ওরা কিন্তু আজও ঠিক ভিটেটা আঁকড়ে সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটির অনেক গভীরে ছড়ানো ওদের পা। একটা পা-কে শক্তি জোগাচ্ছে আরও হাজার গণ্ডা পা। মানুষের মত ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অতো সোজা নয়। হয় নিজের জায়গায় মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে, নয়তো নীরবে মৃত্যুবরণ করবে করাতের দাঁতে কিংবা কুড়ুলের কোপে।

গেটের মধ্যে চারুবালা আর নিশিকান্ত ঢুকে পড়ে। বিস্ময়ে হতবাক— 'এতো ময়দানোর কাণ্ডখারখানা। পুরো সাউপাড়টিকে একাক্কার করে দিয়ে সপ্তরাজের রাজবাড়ি বানিয়েছে!' সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি, পাথর বাঁধানো পথ, পথের দুপাশে জোপঝোপ বাহারে গাছ, বড় বড় বাড়ি, বাড়ির তলায় রংবেরঙের গাড়ি। পুরনো বলতে একজোড়া বকুলগাছ ছাড়া জায়গাটার আর কিছুই চেনার উপায় নেই। বকুলতলায় বিছিয়ে রয়েছে নাকছাবির আকারে অজস্র বাদামি ফুল। বকুলের হালকা গন্ধ মাঝেমধ্যে তদের ছুঁয়ে গিয়ে কাছে ডাকছে—আয়।

—'চলো না কতোদিন বকুলফুল কুড়নো হয়নি।' চারুবালার গলায় কেমন যেন সোহাগি সুর বেজে ওঠে, আর কাঠখোট্টা একরোখা মানুষটাও যেন এক লহমায় ছেলেমানুষটি। মাটিতে পাতা চারুর শাড়ির আঁচলে চারটে হাতের চটপটে আঙুল বেছে বেছে কুড়িয়ে নেয় তরতাজা সদ্যঝরা বকুলফুল। ঝরে পড়া বকুলের সঙ্গে ঝরতে থাকে পুরনো স্মৃতিগুলো— এই গাছদুটোর বাঁদিকে গোইলেটা ছিল, দুটো হেলোবলদ একটা গাই। পাশেই ছোট্ট ডোবা, বর্ষার জলে ধানখেত আর ডোবা একাকার হয়ে যেত। শরতের জল নামলে খেতের যত বিসলে মাছ আস্তানা গাড়তো ডোবাতে। আর ওদিকটায় হেঁসেল, ধানসেদ্ধর উনুন। আধসেদ্ধ ধান জোড়াবকুলের তলায় চাটাই পেতে রোদে শুকনো করা হত। আর ওইখানটাতে এক লাগোয়া দুটো ঘর, সামনে মাটির দাওয়া। ডানদিকের

ঘরটায় ধান থাকতো, আর বাঁদিকেরটা চারুবালার। তক্তাপোষের ওপর বিছানা, মাথার দিকে জানলা খুললেই বকুলগন্ধের ছড়াছড়ি। একটু দূরে বাঁশঝড়া, বোশেখের রাতে ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশের গায়ে বাঁশ শুয়ে অদ্ভুত এক ভূতুড়ে আওয়াজ তুলতো। সেই আওয়াজে চারুবালা ভয় পেয়ে বিয়ের প্রথম রাতে...।

'এ ভাই, ইধার কেয়্যা চাহিয়ে। নিকাল যাইয়ে, নিকাল যাইয়ে। সব পার্টি - পুটিকা গাঁওয়ার আদমি। যাইয়ে যাইয়ে জন্‌সভা উধারসে, ইধার কুছ্‌ভি নেহি।' উর্দিপরা লোকটাকে ক্ষীণ বোঝানোর চেষ্টা করে চারু— 'না বাবা, এদিকটায় একবার এসেছি যখন, ভাবলুম নিজেদের শ্বশুর দাদা-শ্বশুররের ভিটেটাকে দেখে যাই। আর কোনওদিন কি এদিকে আসতে পারবো!' উর্দিদারী কী বুঝলো সেই জানে— 'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, আপ তো পহেলে বাহার যাইয়ে।' হাতে দোলানো লাঠির ডগায় গেটের বাইরে পথ নির্দেশ করার রগচটামানুষটার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে— 'হোই শুমুন্দিরভাই, লাঠি দেকাস কাকে? এক্কা চড়ে না...'। 'কেয়্যা, রোয়াবি!...' উর্দির হাঁকডাকে ছুটে আসে আরও তিন - চারজন উর্দিধারী। ভয়ে চারুবালার গলা শুকিয়ে ওঠে, 'বাবাগো মাপ করে দাও, ওই জ্বোরো মানুষটাকে কিছু বলো না, আমরা চলে যাচ্ছি বাবা।' তবুও কিছুটা ধস্তাধস্তি ঠেলাঠেলির মধ্যে মাটিতে পড়ে যাওয়া নিশিকান্তকে তারা ছুঁড়ে দেয় গেটের বাইরে। চারু ছুটে আসে—'আহা পায়ের ঘা-টাতে আবার লাগেনি তো?'

মিটিং শেষ লরি ছুটছে সুকোর চরের দিকে। নিশিকান্ত গোঁজ হয়ে বসে। চারুবালার হাতে দোমড়ানো দুটো খাবারের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে চার পিস পাঁউরুটি, দু-টুকরো আলুরদম, একটা লাড্ডু। খিদেয় যখন পেট চোঁ চোঁ করছে, তখন এই খাবার! অথচ যাবার আগে শুনিয়েছিল এবারকার খাওয়া - দাওয়ায় নাকি এলাহি কাণ্ড। 'সারাটাদিন মুখে তো কিছু দাওনি, অন্তত মিষ্টিদুটো খাও।' সস্নেহে চারুবালা স্বামীর মুখের কাছে প্যাকেটটা নিয়ে যায়। মানুষটার মুখে কোনও রা নেই, চোখদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে নিশিকান্ত মুখ লুকোতে চায়। হুঁটরো মানুষটার মনের হাল চারুবালা বুঝতে পারে না। ভাকুদার সাগরেদরা উঠে দাঁড়ায়, একজনের হাতে নামের লিস্ট, অন্যজনের হাতে টাকা। লিস্টধারী নাম ডাকে— নিশিকান্ত সাউ। নিশি দু-হাঁটুর মাঝে মাথাটা গুঁজে নেয়। টাকা নেবার জন্যে হাত বাড়ায় চারুবালা। চিৎকার করে ওঠে— 'একি ষাট টাকা কেন? কথা ছিল দুটো মনুষের পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশ টাকা দেবার!' সাগরেদদের একজন ধমকায়— 'চুপ কর, চুপ কর, ম্যালা চেঁচাসনি। ভাকুদা ঠিক করেছে পঞ্চাশ থেকে কুড়ি টাকা মাইনাস পার্টিফান্ডের জন্যে।' কোমরে শাড়ির আঁচলটা গুঁজে নিয়ে চারুবালা একঝটকায় উঠে দাঁড়ায়। তার একঢাল কালোচুল দামাল হাওয়ায় নিশানের মতো উড়তে থাকে। হাঁটুর মধ্যে গুঁজে রাখা হেঁট হওয়া মাথাটা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে এক দঙ্গল ক্লান্ত বিধ্বস্থ ঝিমিয়ে পড়া মানুষের ভীড়ে টানটান দাঁড়িয়ে থাকা উদ্ধত এক নারী। 'কি ভেবেছিস তোরা মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান করিস না, নিকুচি করেছে তোদের নেতার, নিকুচি করেছে তোদের পার্টির।' নিকুচি করেছে, নিকুচি করেছে, শব্দ দুটো পাক খেতে তাকে লরির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, এ মুখ থেকে ও মুখে। সাইড করে লরি থামে, ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে ভাকুদা নেমে আসে, সাগরেদদের সঙ্গে আলোচনা হয়। 'এ দুটোকে লরি থেকে নামিয়ে দে' —ভাকুদা নির্দেশ দিয়ে নিজের সিটে চলে যায়।

অজানা জায়গা, অচেনা পথ, এখান থেকে সুকোর চর কোনদিকে! কতদূর! ধূ-ধূ নির্জন রাস্তায় বিমূঢ় এক দম্পতি। ধোঁয়া উড়িয়ে লরি ছুটে যায় সামনে। কিছুটা এগোতেই থমকায় লরি, ভাকুদা নামে, নির্দেশ এবং সাগরেদরা লরি থেকে আরও কয়েকজনকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। একটু এগোতেই লরি থামে, নির্দেশ ছাড়াই মানুষ নেমে যায় এবং নেমে যায়। মানুষহীন একটা লরি ফিরে চলে সুকন্যার দিকে। রাস্তায় তখন দৃপ্ত মানুষের ঢল আর চারুবালার কোঁচড়ে রাখা বকুলফুলের চরাচর ভাসানো গন্ধ।